অযুত নিযুত আনন্দ

দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা প্রথম কবে ভালো লাগে, কবে প্রথম লিখতে শুরু করি আজ আর সঠিক মনে নেই। ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে শুধু এটুকুই বলতে পারি - কবিতা আজও ভালো লাগে, লিখতে ইচ্ছে করে।

ছয় এবং সাতের দশকে খ্যাত এবং অখ্যাত কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় কিছু কবিতা ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। সে সময় কফি হাউস, দিলখুসার উল্টোদিকে জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান, গ্রেস সিনেমার ওপরে 'পরিচয়'এর অফিস, কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'র দপ্তর, ওদিকে 'কবিতা ভবন', 'নতুন সাহিত্য', শেষের দিকে অতীন্দ্রিয় পাঠকের 'অব্যয় সাহিত্য', ইত্যাদিতে যাওয়া-আসা এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট পত্রিকা সম্পাদনার সুবাদে ছয় এবং সাতের দশকের অনেক কবি-সাহিত্যিকের আড্ডার টেবিলের শরিক হয়েছি। আনন্দ যেমন পেয়েছি, মোহভঙ্গও ঘটেছে অনেক সময়। হঠাৎ কখন নিজের অজান্তেই সরে এসেছি কিছুটা অনাসক্তি, কিছুটা নিজের স্বভাবজনিত আলস্যের কারণে। জীবিকা-সূত্রে কোলকাতার আসর থেকে বাধ্যতামূলক নির্বাসন অবশ্যই আর একটা বড়ো কারণ ছিল। তবু পারিপার্শ্বের সামান্য ইশারাতেও প্রায়শই চকিত হয়েছি। কখনও কাগজ কলমে সে ইশারা ধরা পড়েছে, কখনও পড়ে নি।

আজ জীবন সায়াহ্নে পুরোনো কিছু বন্ধুজনের অনুরোধ, বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্তের অকৃপণ উৎসাহ এবং সর্বোপরি পুত্রপ্রতিম শ্রীমান নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক আগ্রহ — শব্দের নিঃশব্দতায় জমে ওঠা আমার অনেক বেদনা, অজস্র ক্ষোভ, অঢেল স্বপ্ন আর অনেক আনন্দ ঘেরা প্রকাশিত অপ্রকাশিত পঞ্চাশটি কবিতাকে নিয়ে এলো দুই মলাটের মধ্যে – 'অযুত নিযুত আনন্দ' নাম দিয়ে। কিন্তু এত কিছুর পরেও কিছু হত না, যদি 'পুনশ্চ'র শ্রীযুক্ত শংকরী নায়েক ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সন্দীপ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিতেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

পূর্বপল্লী
শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ, ১৪০৬

দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবিতা-প্রসঙ্গে

কবি হিসাবে দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম তেমন পরিচিত নয়। পরিচিত না হওয়ার কারণ অবশ্য কবি নিজেই। ছয়ের দশকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। সাতের দশকে এসে তিনি থেমে যান। দীর্ঘকাল আর তিনি কলম ধরেন নি। প্রায় কুড়ি বছর পর আবার যখন তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন তখন দেখা গেল, তাঁর কবিতা তেমনিই স্বতঃস্ফূর্ত, সচল, ছন্দোময় এবং অর্থগভীর।

তাঁর কোনো কবিতাই আকারে বড়ো নয়, যেন একটা অনুভূতি বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎ এসে নিভে যায়। ওই আকস্মিক আলোতে চোখে পড়ে বিশ্বভুবনের একটা চিরকালের রূপ। দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য চকিতের সঙ্গে নিত্যকার অনুভবকে মেলানো। পাঠকের তৃপ্তি এখানেই যে, মুহূর্তের কর্কশ অভিজ্ঞতাও রসের আস্বাদনে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন কবিতার সার্থকতা এভাবেই হয়, মুহূর্তও নিত্য হয়ে ওঠে। যেটা এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা কবি তাকে বিশেষ থেকে নির্বিশেষ করে তোলেন। সে কৌশল বোঝাবার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সে রহস্য জানেন শুধু কবি। তিনি ব্যাকরণ মেনে লেখেন না, তবু ভাষা দেন তিনিই। আমাদের প্রাচীন রসজ্ঞেরা একথা যেমন বুঝিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি করে বুঝিয়েছেন। প্রাচীনেরা এজন্য একটা শব্দ ব্যবহার করতেন - সাধারণীকরণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সাধারণের জিনিসকে বিশেষ ভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষ ভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।' সেই উপায়টা কি ব্যাখ্যা করে বলা মুশকিল। দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ধরেই তার চেষ্টা করা যাক। কবিতার নাম 'মণিময় কিছুই দ্যাখে নি'।

কাশফুলই নাকি পথ, পথে নাকি সূর্যের আবীর
ও দিকে ঘাসের নীচে মিছিমিছি খেলা করে সাপ ও শিশির।
আমি তো দেখি নি কোনোকিছু, দেখেছিল শুধু মণিময়:
সে বলেছে শরতের কাল হলে এরকমই হয়।
শরতেই হোক কিবা শীতে – এই সব বড়ো দৃশ্যময়,
আমি তো দেখি নি কভু দেখেছিল শুধু মণিময়।

আমি তো দেখেছি গোলাগুলি, আগুনের নীল নীল শিখা,
ভারী কালো বুটে ঢাকা মৃত্যুর কতো বিভীষিকা!
তাজা রক্তের রঙ, বেয়নেট গাঁথা আর্তধ্বনি –
আমিই দেখেছি শুধু মণিময় কিছুই দ্যাখে নি।

দশ পঙক্তির কবিতা, অতএব সনেট নয়। কিন্তু এর ছয় পঙক্তিতেও বক্তব্যের একটা ভাগ তৈরি হয়েছে, বাকি চার পঙক্তিতে এসেছে দ্বিতীয় ভাগ এবং সবশেষের 'মণিময় কিছুই দ্যাখে নি' তে দুটো ভাগ একটা সাধারণ বক্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে। এই কবিতায় মণিময় একজন কাল্পনিক ব্যক্তি, যে কেউ হতে পারে অথচ তাকে একটা সামাজিক নাম দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হোলো, জীবনানন্দের কবিতায় যেমন হয়ে থাকে। মণিময় জগৎকে দেখেছে তার প্রাকৃতিক অস্তিত্বে সুন্দর এবং অসুন্দরকে মিলিয়ে। সাপ ক্রূরতার প্রতীক আর শিশির স্নিগ্ধতার। দুই-ই সমান অস্তিত্ববান। শরতেই হোক আর শীতেই হোক – দুইই সমান দৃশ্যময় সত্য। আর একজনের কাছে জগতের এই সমগ্রতা নেই। সে দেখছে শুধু মৃত্যুকে, দুঃখকে, পীড়াকে। শরৎ ও শীত পৃথিবীর নিত্যচলিষ্ণুতার প্রতীক। এই পরিবর্তনশীল জগৎ এই বিচিত্র বিপরীতকে নিয়েই তো সমগ্র। এক শ্রেণীর মানুষ জীবনকে এই সমগ্রতার মধ্যে দেখেই আনন্দকে খুঁজে পায়। আর যারা মানুষের দুঃখ বেদনাকেই শুধু দেখল তারা সৃষ্টির শুধু একটা দিককেই দেখল। কার দেখা সত্য ? কার দেখা পূর্ণতাকে দেখা ?

কয়েকটি প্রতীকে বা চিত্রকল্পে কবি জানালেন জীবনকে গ্রহণ করবার দুটি প্রবণতার কথা। কোনটি মহত্তর ? বস্তুবাদী রিয়ালিস্ট না অখণ্ডতাবাদী ইউনিভার্সালিস্ট? এই কবিতায় কবি এর স্পষ্ট কোনো উত্তর দেন নি। যদি দিতেন তবে তিনি আর রসিক কবি হতেন না, তিনি হতেন দার্শনিক। দার্শনিকেরাই সৃষ্টির অর্থ সন্ধান করে বেড়ান। আমাদের

কবি রসিক হয়েই থাকলেন। অথচ জিজ্ঞাসার একটি ইঙ্গিত থেকে যাচ্ছে অতি পরিচিত লৌকিক কয়েকটি দৃশ্যচিত্রের উল্লেখে। মণিময় নামে এক ব্যক্তি - কবিরই আর এক সত্তা এই জিজ্ঞাসাটিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কঠিন কঠোর বস্তুজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই জেগে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক একটি জিজ্ঞাসা।

দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি লক্ষণ, তিনি কোনো আকস্মিকতার বা অসামান্যতার অভিজ্ঞতা অবলম্বন করেন না। তাঁর আঁকা ছবিগুলি কোনো কল্পিত জীবনের নয়, কোনো অতিনাটকীয় ঘটনারও নয় -

কিন্তু যখন দেখলাম
একটি বালিকা উপবিষ্ট ঐ চেয়ারের হাতায়
সূর্যের কিরণ তার চুলের ওপর খেলে যায় -
অমনি রক্তে এল উষ্ণতা, মনে এল বার্ধক্যের ভয়
এই একটি প্রকৃত ঘটনায়।

বলতে গেলে এটা কোনো ঘটনাই নয়। একটি মেয়ে চেয়ারের হাতায় বসেছে, তার চুলে এসে পড়েছে সূর্যের আলো - এটাই কবির কাছে হয়ে উঠল একটা ঘটনা। অসামান্য হয়ে উঠল এই ঘটনাটি এবং উদ্‌বোধিত হল কবির মনে ভালো লাগার আনন্দ।

এ ধরনের সাধারণ ঘটনা থেকে তাঁর মন যে জেগে ওঠে, একটা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে - সেখানেই তাঁর কবিতার চমৎকারিত্ব। কবিতার আস্বাদ নিয়ে আসবার জন্য তাঁকে কোনো বিশেষ বা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয় না। আমাদের রোজকার যা দেখা, যা শোনা তার থেকেই তাঁর কবিতার জন্ম।

এমন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে এসে যায়। আধুনিক কবিতা আমাদের রোজকার দেখা-শোনার জগৎ নিয়েই লেখা হয়ে থাকে। আধুনিক কবিতার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক আধুনিক জীবনের। আধুনিক জীবন বলতে বোঝায় সংগ্রামে বিজ্ঞানে নাস্তিক্যে অনৈতিকতায়, ধনীর বিলাসে, দরিদ্রের হাহাকারে, অর্থনৈতিক অসাম্যে, স্বার্থান্বেষীর ক্রূরতায়, মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের বিনষ্টিতে এক জীবন, আবার দেশবিদেশের মানবিক সম্পর্কে, নির্জাতীয় মানবতাবোধে সংহতিতে স্বাতন্ত্র্যে সচেতনায় এক নতুন পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথের পর এই পৃথিবী, এই সমাজই কবিতার বিষয়। এই সমাজে মানুষ অনেকটাই হারিয়েছে তার ব্যক্তিরূপ। সে হয়ে উঠেছে এক একটা দুঃখ যন্ত্রণা প্রেম ঈর্ষা দ্বন্দ্বের

প্রতীক। কবিতায় আমরা যার কথা পড়ি সে এই আধুনিক পৃথিবীর মানুষ। দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই মানুষকে পাই বলে স্বস্তি মেলে। তিনি এসকেপিস্ট নন। তাঁর চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাঁর একটি কবিতার নাম 'হে ঈর্ষা তুমিই সত্য'। 'আদম এবং আপেল' কবিতায় চমৎকার রূপকের ভাষায় তিনি তীক্ষ্ম করে তুলেছেন মানুষের ভোগবৃত্তির অনিবার্যতাকে – 'মর্ত্যে এখন আপেল নিয়ে অনন্তকাল লোফালুফি'। কখনও দেখছেন একটি ধর্ষিতা মৃত মেয়েকে, কখনও বলেন 'কুঁড়িগুলি ছিঁড়ে নিলে পিষে দলে দিলে / গোলাপ আর থাকবে না কবিতায় গানের নাগালে।' আছে করুণ বেদনার সুর 'মৃত্যুই শেষ জানি তবু মুখ ঘুরিয়ে/ বাঁচতে চেয়েছি শুধু দিন গেছে ফুরিয়ে'। এরকম অজস্র পঙ্‌ক্তি ছড়িয়ে আছে দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যার ভেতর দিয়ে আধুনিক জীবনের মর্মদাহ ফুটে উঠেছে অসাধারণ মিতভাষণে।

তবু বলব আধুনিক জীবনের এই বিক্ষিপ্ত চিত্র থাকাটাই তাঁর কবিতার একমাত্র লক্ষণ নয়। তাঁর মধ্যে সুন্দরের জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে, ভালোবাসার জন্য পিপাসা আছে, মানুষের ক্রূরতার প্রতি বিদ্রূপ আছে। ইতিপূর্বে বলেছি বিশেষকে তিনি নির্বিশেষ করে তুলতে পারেন অর্থাৎ এমন ঘটনা ঘটে যা সভ্যতার বিকৃতি বা মানুষের বিপথগমন, তবু কবির প্রকাশভঙ্গিতে ব্যক্তিগত জ্বালা সর্বকালীন নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করেছে। কবির প্রকাশে আছে ধীরতা, স্বল্পভাষণ, ইঙ্গিত, সমাহিত চেতনার উচ্চারণ। তাঁর করিতায় এমন বিষয় আছে যা খবরের কাগজের শিরোনাম হতে পারে, আবার এমন বিষয়ও যথেষ্ট যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। বিষয়ের গৌরবে নয়, আত্মমুখিনতায় এবং প্রকাশের ভাষাতেই তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য।

কবিতা তো আত্মমুখীই হয়। তাতে দীপেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? এর উত্তর এই যে, তাঁর কবিতা কল্পনার সৃষ্টি নয়, আবার নিছক বস্তুগত বর্ণনাও নয়। একটা বস্তুগত উপলক্ষ মাত্র খোঁজেন, তারপর তার থেকে তিনি নিজস্ব একটা ভাবনার ইঙ্গিত দেন। বস্তুটি স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের চোখে টুকরো ছবি হয়ে ওঠে। আর শেষের দিকে দেখা যায় কবির মনে একটা ভাবনার ইশারা নিয়ে এসেছে। এই ভাবনাতেই তাঁর আত্মমুখিনতা। আত্মমগ্ন ভাবনার প্রকাশও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে। একটা কবিতার নাম 'উট'। উটের পিঠে উঠে মরুবালু পেরিয়ে যেতে হয়। রুক্ষ মরুজীবন পেরিয়ে যাওয়ার জন্য কবি স্মরণ করছেন উটের মতো একটা বাহন। বাংলা ভূমিতে এই জীবটি নেই। তথাপি

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতোই দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই প্রতীকটিকে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে উটের ছবিটির চেয়েও বড়ো কবির ভাবনামগ্নতা। ছবিটি সংক্ষিপ্ত হলেও আয়ত একটি চিত্রকল্প। এ রকম চিত্রকল্প অবলম্বন করে তিনি ফুটিয়ে তোলেন শূন্যতাকে, প্রেমকে, বিষাদকে, বাঁচার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে, জীবনবিধাতার ব্যঙ্গকে। তাঁর কবিতার মস্ত বড়ো গুণ হচ্ছে পরিমিত কথন। কোনো কবিতাই দীর্ঘ নয়। কিন্তু সব কবিতারই ফলশ্রুতি ঘটে একটি উপলব্ধিতে।

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় কবির নির্বিকার নিস্পৃহতা। এ তাঁর নৈর্ব্যক্তিক চেতনারই ফল। তাঁর কবিতায় আমরা তেমন মগ্নতা, গাম্ভীর্য ও গূঢ়তা পাই না, যেমন পাই জীবনানন্দের কবিতায়। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে হালকা এবং চপল বলেই মনে হবে। তাঁর ভাষাতেও প্রসাধিত শব্দযোজনা পাওয়া যাবে না। আমাদের রোজকার চলতি শব্দ দিয়েই তিনি লেখেন। আলাদা করে 'কাব্যিকতা' তিনি চান না। মৌখিক ইডিয়ম অতি অনায়াসেই এসে যায়, তাতে আসে চলতি জীবন, চলতি কথার দ্রুততা। চারপাশের জীবনের অতি প্রত্যক্ষ বাস্তব চলমানতাই তাঁর ব্যবহৃত চলতি ভাষায় এবং ভঙ্গিমায় রূপ লাভ করে। এর মধ্যে দিয়েই একটা গভীরতার আভাসও আসে।

তাঁর কবিতার ছন্দে এবং ভাষায় লৌকিক ছড়ার প্রভাবও পাঠক অনুভব করবেন।ছড়ার প্রকৃতির দিকে তাঁর একটা টান আছে।আমাদের দেশে ছড়ার লঘু ছন্দের হসন্ত প্রকৃতি তাঁর কবিতায় বিশিষ্ট ধ্বনিরূপ রচনা করে। হসন্ত ধ্বনির প্রাচুর্য এবং মাপা পর্বের বিন্যাসে কবিতার পঙক্তিগুলি দ্রুতগতি লাভ করে। পর্ব চারের, পাঁচের, ছয়ের এমন কি সাত মাত্রারও আছে। হসন্ত ধ্বনির সঙ্গে পরিমিত মাত্রার ব্যবহারে বেশ একটু ব্যাঙ্গাত্মক চপলতাও এসে যায়। এদিক দিয়ে খানিকটা যেন সমর সেনের স্টাইলের আভাস মেলে তাঁর কবিতায়। তাঁর ব্যঙ্গের তীব্রতা —

সেদিন থেকেই অ্যাসিড ছুঁড়ি অলি গলি মেট্রো রেলে,
ধর্ষণে আর ফুলশয্যায় নারীর মূল্য তুল্যে মূল্যে।

দীপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ব্যঙ্গাত্মক স্টাইলের জন্য কখনও কখনও পাঠকও তাঁকে ভুল বুঝতে পারেন। তাঁর বেদনার গভীরতা কোনো কোনো সময়ে ছন্দের চটুলতায় কিংবা প্রতীকের অদ্ভুতত্বে ঢাকা পড়েও যেতে পারে। তাত্ত্বিকেরা বলেন, ছন্দ বা অলংকারকে হতে হবে ভাবের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অর্থাৎ ছন্দ যদি বড়ো হয়ে ওঠে, অথবা অলংকারই যদি

আলাদাভাবে শ্রবণীয় হয় এবং অন্তর্গত ভাবকে গৌণ করে ফেলে, তাহলেই কবিতার দুর্দশা। এসব তত্ত্বের সার্থকতা আছে। কিন্তু এই বিশ শতকের শেষে যখন পৃথিবী থেকে রহস্যের অস্পষ্টতা চলে যাচ্ছে, অনির্বচনীয় নামক কোনো ভাবকে ভাষায় অনুভব করানোর দরকারই থাকছে না, তখন কবিতার ভাষাতেও দরকার হয়ে পড়ে স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টতা। এই গুণটিকে রক্ষা করতে গিয়ে ছন্দে যদি কিছু স্খলন ঘটে, মিল যদি নিখুঁত না হয় তাহলে সেটা কবিতার দোষ বলে গণ্য হবে না। স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টতা আনবার জন্যই তো গদ্যছন্দের আর্বিভাব। কিন্তু কবিতার নিজেরও রূপগত প্রকৃতি আছে। তাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনও কবি অনুভব করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ছন্দ ও মিলের কিছু ত্রুটি ঘটলেও আজকের কবিতায় সে ত্রুটিও কাব্যভোগে সহায়ক হয়ে ওঠে।

দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ভাবে ও রূপে আধুনিক যুগসচেতন এবং বিচারাত্মক বা ক্রিটিক্যাল। ভাবাবেগের লক্ষণ তাতে নেই, আছে এক পরিচ্ছন্ন অনুসন্ধানী মন যা দুঃখ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামের মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছে সুন্দর স্বচ্ছন্দ ভাবে বেঁচে থাকার আনন্দকে। তাই তাঁর কবিতার বইয়ের নাম ‘অযুত নিযুত আনন্দ’।

কুন্দকলি
রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন

ভবতোষ দত্ত

কবিতা মানেই

কবিতা মানেই লাইনটানা খাতা,
কবিতা মানেই চিলেকোঠার দুপুর।
কবিতা মানেই মনের সঙ্গে কথা,
কবিতা মানেই কখন আসবে নূপুর ?

কবিতা মানেই জোড় বিনুনীর দোলা,
কবিতা মানেই ত্রস্তে কুড়োনো চিঠি।
কবিতা মানেই ফিসফিসিয়ে বলা,
কবিতা মানেই টুকিটাকি খুনসুটি !

কবিতা মানেই কলেজের ফুটপাত।
কবিতা মানেই অনেকক্ষণের কফি,
কবিতা মানেই ঘামে ভেজা দুটো হাত,
কবিতা মানেই কালকে আসবে নাকি ?

কবিতা মানেই হলুদ শাড়ির পাড়,
কবিতা মানেই চৌখুপী এক ঘর।
কবিতা মানেই বাজার করার তাড়া,
কবিতা মানেই ছোটো ছেলেটার জ্বর !

কবিতার জন্য অপেক্ষা

কবিতা মানেই বুঝি সারাবেলা সেই
ছিপ হাতে বসে থাকা পুকুরের পাড়ে,
ফাতনায় চোখ রেখে মাছ কিছু পাই বা না পাই
প্রতিদিন বসে থাকা – মাছেরই আশায়।
তেমন আমিও তবে আজ বসে আছি
চৈত্র-দুপুর ঃ ঘুঘুর ডাকের কাছাকাছি।
দূর থেকে ভেসে আসে ঝাপটানি হাওয়া,
স্মৃতি হাতড়াই যদি যেত কিছু পাওয়া;
দু-চারটে শব্দ আসে শরতেরই মেঘ –
ছিপছিপে বৃষ্টি নিয়ে লুকোনো আবেগ।
কোথা সেই দুইকূলপ্লাবী শ্রাবণের ধারা
মেঘেদের গর্জনে ফেলে দেবে সাড়া
শব্দেরা আসবেই বর্ষার ঝরোঝরো জল
কবিতা লেখার স্বপ্ন হবে যে সফল।

উট চাই

আমার একটা উট চাই পরিপূর্ণ অলৌকিক জলের সঞ্চয়ে,
কবে থেকে বসে আছি আদ্যোপান্ত পিপাসার্ত হয়ে ।
পৌরাণিক মরুযানগুলি বালি ভেঙে যায় সারি সারি,
পূর্বপুরুষেরা সব একদিন ছিল শুনি উটের পূজারী ।
সেইমত দশটি নয় পাঁচটি নয় একটিমাত্র উট চাই আমি
উটে করে পার হয়ে যাবো পৃথিবীর যতো মরুভূমি ।
তারপরে খুঁজে পাবো খেজুরের ছায়াঘেরা চিকচিকে জল–,
আঙুর লতার স্বপ্ন : মদিরার গন্ধমাখা সাকীদের দল ।
উট চলে পিঠ দোলে জল কই ধূধূ করে শুধু মরুভূমি,
জানি আমি একদিন মরু হবে পৃথিবীর সব বাসভূমি !

পাপ

গীর্জার ভেতরে ঢুকে সব পাপ উচ্চারণ করি,
মন্দিরে মন্দিরে মাথা খুঁড়ি ; ঘুরে মরি,
কখনওবা মসজিদে দূর ওই আজানের স্বরে
দুটি কান ভরে নিই – ভাবি পাপ যদি যায় ঝরে।
উচ্চারণে আচমনে অথবা সে দূরের শ্রবণে
কিছুই হলো না হায় গৈরিক সন্ন্যাসে বা দানে
এ পাপ তোমারই অভিশাপ, এই পাপে নেই কোনো দায়–
বলামাত্র এই কথা বৃষ্টি হয়ে পাপ ধুয়ে যায় !

শ্মশানে প্রেম

শ্মশান-দেওয়ালে কারা লিখে গেছে ‘প্রেম’,
কাঠকয়লাতে পাশেই লিখেছে ‘বিষাদ’
তার পাশে লেখা যুক্ত চিহ্ন দিয়ে
বাঁকা অক্ষরে ‘রজনী’ এবং ‘হেম’,
জেহাদেরই সুরে অনেক অশ্রু নিয়ে
কারো বা ঘোষণা ‘অমর জিন্দাবাদ’।

এদিকে বাতাসে মাংস পোড়ার গন্ধ;
আগুনের শিখা দেওয়ালকে ছুঁয়ে যায়,
রজনী-হেমের গা-ঘেঁষা আগুন-ছন্দ -
অবিনশ্বর প্রেমকে পোড়াতে চায়।

শ্মশানে হাজার রজনী-হেমের চিতা,
তবুও দেওয়ালে বেয়াকুব আলপনা;
প্রেম-বিষাদের আবেগে টুকরো কবিতা
চিতার আগুন কখখনো পোড়াবে না।